বাঙ্‌লা বর্ণমালার বর্ণময় রঙীন যাত্রাপথ

ডঃ রীতা ভট্টচার্য

বাঙলা ভাষার মুখ বলতে যাদের আমরা বুঝি সেই অ - আ, ক - খ বর্ণমালার ইতিহাস বড় কমদিনের নয়। আজ থেকে কমপক্ষে আড়াই বা তিনহাজার বছর আগে এই বর্ণমালার যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মী বর্ণমালার হাত ধরে। 'ব্রাহ্মী' নামটি কোথা থেকে এসেছে সে নিয়ে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। তবে শাস্ত্রমতে এই 'ব্রাহ্মী' শব্দটির নানারূপ ব্যাখ্যা রয়েছে। সংস্কৃত প্রামাণ্য কোষগ্রন্থ 'অমরকোষে' বলা হয়েছে 'ব্রাহ্মী-তু ভারতী ভাষা' অর্থাৎ দৈবীভাষাই হল ব্রাহ্মী। এছাড়াও খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকে রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ 'ললিতবিস্তরে' বুদ্ধদেবের শিক্ষাব্যবস্থায় যে ৬৪ টি লিপির বর্ণনা আছে তার প্রথম লিপিটিই ছিল ব্রাহ্মীলিপি, সেই হিসাবে 'ব্রাহ্মী' কে আদিলিপি বলে ধরা হয়।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে এই ব্রাহ্মী লিপির প্রথম প্রকাশ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। সম্রাট অশোক তাঁর অনুশাসনগুলি পালি ও প্রাকৃত ভাষায় পাথরের গায়ে খোদাই করতেন এই ব্রাহ্মীলিপির মাধ্যমে। সম্রাট অশোকের সময় পাওয়া প্রস্তর অভিলেখ (Rock Edict Inscription) অথবা স্তম্ভ অভিলেখে এর নিদর্শন পাওয়া যায় (Pillar Edict Inscription)।

মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় প্রচলিত 'ব্রাহ্মী'লিপি 'মৌর্য ব্রাহ্মী' নামে পরিচিত। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী থেকে ১ম শতাব্দী পর্যন্ত এই লিপির সময়কাল ধরা যেতে পারে। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের অনুশাসনসম্বলিত একটি বিশালাকৃতি প্রস্তরখন্ড নতুন দিল্লীর রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগারে (National Archives) সংরক্ষিত আছে, তার মধ্যে ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই মৌর্য ব্রাহ্মী কিছুটা পরিবর্তিত আকারে কুষাণসম্রাট কণিষ্কের সময় বিভিন্ন প্রস্তরলেখ বা তাম্রফলকে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ৩য়- ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত যে সমস্ত অনুশাসন পাওয়া যায়, সেগুলি লেখা হত 'কুষাণব্রাহ্মী' তে। মধ্য এশিয়ার তুর্ফান অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া যায়, তাঁর অধিকাংশই ভুর্জপত্রে কুষাণব্রাহ্মীতে লিখিত। মৌর্যব্রাহ্মী যেমন কেবলমাত্র পাথর বা তাম্রফলকে উৎকীর্ণ হতে দেখা যায় কোন পুঁথিপত্রে এর নিদর্শন মেলে না। কিন্তু কুষাণসম্রাট কণিষ্কের সময় প্রথম কুষাণব্রাহ্মীতে লিখিত পুঁথি পাওয়া যায়।

এই কুষাণ ব্রাহ্মীই ধীরে ধীরে তার খোলস বদলে গুপ্তযুগের রাজাদের আমলে গুপ্তব্রাহ্মী নামে পরিচিত হয়। জামাকাপড় বদলানোর মত ধীরে ধীরে অক্ষরগুলি তাদের রূপের কিছুটা পরিবর্তন ঘটালেও মূল কাঠামোটি কিন্তু একই চেহারায় আজও বর্তমান। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ , মেঘদূত, রাঘুবংশ - এদের মত কালজয়ী নাটক ও কাব্য যা আজ আমরা দেবনগরী লিপিতে পড়তে অভ্যস্ত সেগুলি কিন্তু গ্রন্থকার লিখেছিলেন এই গুপ্তব্রাহ্মীতেই। কারণ তখন পর্যন্ত দেবনগরী লিপির আবির্ভাবই ঘটেনি। ফলে দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত প্রাকৃত ও পালি ভাষায় লিখিত যাবতীয় গ্রন্থ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্তব্রাহ্মীতেই লেখা হত। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং সমুদ্রগুপ্তের লিখিত অনুশাসন মুদ্রা ও তামার ফলকে এই লিপিতে লিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। এই গুপ্ত ব্রাহ্মীই ভারতবর্ষের বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে আরও কয়েকটি নতুন লিপির জন্ম দেয়। ভারতবর্ষের উত্তরে অর্থাৎ কাশ্মীরে এই লিপি 'সারদা' নামে অভিহিত। অভিজ্ঞানশকুন্তলমের অনেক পুঁথিই এই সারদা লিপিতে দেখতে পাওয়া যায়।

উত্তরভারতের সারদালিপির মত দক্ষিণভারতে গ্রন্থলিপি, পূর্বভারতে গৌড়ীলিপি, পশ্চিমভারতে

নাগরী, নেপালে নেওয়ারি এবং তিব্বতে তিব্বতীলিপি গুপ্তব্রাহ্মীরই প্রত্যক্ষ অনুগামী (Direct Offshoot) কেবলমাত্র সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ লেখার তাগিদে দক্ষিণভারতে গ্রন্থলিপির প্রবর্তন হয় যা পরবর্তী'কালে জন্ম দেয় তামিল, মালায়ালম এবং কন্নড় লিপির। দক্ষিণ ভারতে বৈদিকগ্রন্থের অধিকাংশ পুঁথি এই গ্রন্থলিপিতে লিখিত। সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থলিপির ব্যবহার দেখা যায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পল্লবরাজাদের তাম্রশাসনে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এবং বৌদ্ধতন্ত্রের পুঁথি লেখার কাজে ব্যবহৃত তিব্বতী ও নেওয়ারি লিপি গুপ্ত ব্রাহ্মী থেকেই উদ্ভূত বলে অধিকাংশ লিপিবিশেষজ্ঞ মনে করেন।

পূর্বভারতে প্রচলিত গুপ্তব্রাহ্মী নেওয়ারি ও তিব্বতীলিপির উত্তরসূরি হিসাবে যে গৌড়ীলিপি পাওয়া যায় তা কালের অমোঘ গতিতে বিভিন্ন চড়াই উতরাই পার হয়ে মসৃণ জমি পেল ১৮শ শতাব্দীর শেষের দিকে মধ্যযুগীয় বাঙলা লিপিতে। প্রাচীন বাঙলাসাহিত্যের চর্যাপদের পদসমূহ রচিত হয়েছে গৌড়ী লিপিতে। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এই গৌড়ীলিপি কিছুটা পরিবর্তিত আকারে সৃষ্টি করল মধ্যযুগীয় বাঙলা লিপি।

ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেকাংশের মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অঞ্চলে 'কুটিল লিপি' নামঙ্কিত যে গুপ্তব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল, তা থেকেই মধ্যযুগীয় বাঙলা লিপির উদ্ভব। বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের ও শাক্ত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থ এই মধ্যযুগীয় বঙ্গ লিপিতে লিখিত।

মধ্যযুগীয় বাঙ্লা লিপির সাথেই হাত ধরাধরি করে চললো মৈথিল ও ওড়িয়া লিপি। ওড়িয়া লিপিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় - (১) 'ব্রাহ্মণী' - যা মূলতঃ ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ লেখার জন্য ব্রাহ্মণেরা তালপাতায় লিখতেন। (২) 'করণী' - যা 'করণ' শব্দ থেকে উদ্ভূত সরকারী নথিপত্র লেখার কাজে ব্যবহৃত হয়। (৩) 'সাধারণ' - গঞ্জাম জেলার (প্রাচীন উৎকল) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তেলেগু লিপির ঢঙে সাধারণভাবে একটি গোলকৃতি লিপির ব্যবহার হতে দেখা যায়।

ওড়িয়া লিপি দক্ষিণ ভারতের ছায়ায় লালিত বলে তার মধ্যে গ্রন্থলিপির প্রভাব দেখা যায়। বাংলা বিহার উড়িষ্যা পর্যন্ত বৃহৎ বঙ্গদেশের অধীনে থাকার ফলে ১৪শ থেকে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত এক লিপি অন্য লিপির সাথে মিলেমিশে সহাবস্থান করতে লাগল। সেই কারণেই মধ্যযুগীয় বাঙলা লিপিতে লেখা হয়েছে চৈতন্যচরিত্রামৃত, চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যলীলা বিষয়ক বহু গ্রন্থ। আবার অন্যদিকে ওড়িয়া লিপিতে লেখা হল চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের বহু জায়গায় বাঙলা ভাষায় লিখিত বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ চৈতন্যদেব তার ওড়িয়াবাসী ভক্তদের বাঙ্লা ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে এই ধরণের পুঁথি লেখার বন্দোবস্ত করেন। আজকের আধুনিক বঙ্গলিপি এদেরই উত্তরসূরি। সেই লিপিতে লেখা হয়েছে বঙ্গ সাহিত্যের অনন্ত ভান্ডার।

পুঁথিলেখদের লিপিকর নামে অভিহিত করা হত। এই সব লিপিকরেরা বিভিন্ন লিপি পড়তে পারতেন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে পেশাগতভাবে তারা এই কাজ করতেন। ফলে এক লিপির প্রভাব অন্য লিপিতে পড়ত। অনেকসময় একই গ্রন্থে মিশ্রলিপির ব্যবহারও চোখে পড়ে। এই লিপিকিরদের মাধ্যমে একদেশের ধর্মবিশ্বাস, জীবনচর্যার ইতিহাস অথবা ধর্মীয় ভাবনা অন্যদেশের ধর্মীয় বিশ্বাস বা ভাবনা সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এইভাবেই নির্মিত হয়েছে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের অদৃশ্য বেদিমূল। আর এই সমন্বয়ের সূত্র ধরেই পরিপুষ্ট হয়েছে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি। আমরা বঙ্গভাষীরা যে ধরণের লিপিতে লিখতে অভ্যস্ত -বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি তা বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে নানা দেশীয় লিপির প্রভাব। কখনও তা নেওয়ারি লিপির সঙ্গে তুলনীয় আবার কখনও বা সারদা লিপির মত।

পুঁথি সংরক্ষণের প্রশ্নটিও পুঁথিচর্চার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পুঁথিসংরক্ষণের ক্ষেত্রে পুঁথি লেখকের আর্তবাণী-

তৈলাদ্রক্ষ জলাদ্রক্ষ রক্ষ মাং শ্লথবন্ধনাৎ।
আখুভ্যঃ (মূষিকেভ্যঃ) পরহস্তেভ্যঃ এবং বদতি পুস্তিকা।।

অর্থাৎ বাঁচাও আমাকে তেল থেকে, জল থেকে, আল্‌গা বাঁধন থেকে ইঁদুর এবং অন্যের (চোরের) হাত থেকে - এই যেন বলছে পুঁথি। পুঁথির এবং পুঁথি লেখকের এই সকরুণ আর্তি যদি সকলের কর্ণকুহরে আঘাত করে তবেই পুঁথির আদর্শ সংরক্ষণ। এই ভাবেই সামগ্রিক পুঁথিচর্চা ও অনুসন্ধান ভারতের সমন্বয়ী ঐতিহ্যের ঐতিহাসিক ও তার রূপরেখাকে পুনরুদ্ভাসিত করতে সাহায্য করবে।

আজ চতুর্দিকে বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার যখন মানুষকে সর্বনাশা ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন মৌলিক পুঁথিচর্চার মাধ্যমে সংশ্লেষণী গবেষণার অপরিসীম তাৎপর্য রয়েছে। বাঙ্‌লা লিপির উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে সংস্কৃত, বাংলা, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষকরা যদি তথ্যসূত্র হিসেবে পুঁথির সাহায্য নেন, তবেই গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান মেলার সমূহ সম্ভাবনা আছে।